।নি।ব।ন্ধ।

# একটি গ্রামীণ বছর বরণের চালচিত্র

## সাইমন জাকারিয়া

একসময় এদেশের গ্রামে গ্রামে বাংলা বছরকে বেশ ঘটা করে স্বাগত জানানোর চল ছিল। এই মন্তব্যের প্রধান কারণ হচ্ছে– এখনও এদেশের কোনো কোনো গ্রামে সেই চলের একটি প্রবাহমান রূপ রয়ে গেছে, কোথাওবা সে চল কালের নিয়মে একটুখানি চেহারা বদলে নিয়েছে, আর কোথাও তা এখন প্রায় বিলুপ্তির পথে এবং কোথাও সে চল এখন হয়ে গেছে অতীত। যে চল অতীত হয়ে গেছে সে চল নিয়ে এ রচনা নয়, এ রচনাটি সেই চল উদ্‌যাপনকারী একটি এলাকাকে ঘিরে। এলাকাটি টাঙ্গাইল জেলার মির্জাপুর থানাধীন নগরভাদগ্রাম, চরপাড়া ও শেওড়াতৈল গ্রাম। এই গ্রামগুলো প্রায় ২৫০ থেকে ৩০০ বছর ধরে বাংলা বছর বরণ ও বিদায়ের নিজস্ব কিছু কৃত্যানুষ্ঠান পালন করে আসছে। এই সব কৃত্যানুষ্ঠানের মধ্যে আছে– শোভাযাত্রা, নৃত্যগীত, বীচট, কালীকাচ, পরীনাচ, ডুগনী, কবিতা, কুচকি বানাম, মইন জাগানো, সঙখেলা, চড়ক ও স্বাদ গ্রহণ। এবারে আমরা পর্যায়ক্রমে সেই সব কৃত্যানুষ্ঠান, নাট্যপালা ও চড়কের বিবরণ তুলে ধরছি। তার আগে বলে রাখি– এই দেশে আসলে একটি বছর-বরণের চলের প্রধান প্রবণতা হচ্ছে আগের বছরটিকে

ঘটা করে বিদায় জানানো, এই বিদায় জানানোর মধ্যেও থাকে বিচিত্র কৃত্যানুষ্ঠান, আমাদের লেখাটি তাই বছর বিদায়ানুষ্ঠান দিয়েই শুরু হলো।

### বছর বিদায়ের কৃত্যাচার

নগরভাদগ্রামে প্রবেশের পথেই আমাদের চোখে পড়ে– পুরাণের চরিত্রগুলো রাস্তায় বেরিয়ে এসেছে। তারা সার বেঁধে মিছিল করে চলছে। তাদের কেউ শিব-পার্বতী, কেউ অসুর, এমনকি হনুমানজি, কালী, রাধা-কৃষ্ণ প্রমুখ সপ্রতিভায় সেই মিছিলে, মানে শোভাযাত্রায়। বয়সে তারা সবাই তরুণ ও শিশু-কিশোর। কিন্তু বছর বিদায়ের শোভাযাত্রায় তারাই আজ সেজেগুজে স্বরূপে হয়ে উঠেছে পুরাণের দেব-দেবী। আমরা দেখি, গ্রামের সবাই এমনকি

evB`¨v bvP : ewoi DV‡b N‡i N‡i Gfv‡eB †b‡P †M‡q P‡j mviw`b

পথিকেরাও সর্বত্রই তাদের সম্মান-সমাদর করছে, পূজা-প্রণাম করছে। আর প্রণাম-সম্মান পাবার পর দেব-দেবীগণ একটুখানি গান গেয়ে নেচে আবার সামনে এগিয়ে যায়।

মেটে-পথের ধুলো পেরিয়ে আমরা সামনে এগিয়ে যেতেই দূর থেকে খোল-মন্দিরার তাল ভেসে আসে কানে। আমরা নগরভাদগ্রামের সুবাসচন্দ্র বণিকের বাড়িতে ঢুকে পড়ি। বাড়ির উঠানে সুর-নাচ-তাল একাকার হয়ে অপরূপ এক ইন্দ্রজালে আমাদের দশাগ্রস্ত করে। এর নাম বাইদ্যা নাচ। আমরা মুগ্ধ বাইদ্যা নাচ দেখি।

এই বাইদ্যা নাচে দুই বাইদ্যানী নেচে নেচে তাদের একমাত্র বাইদ্যাকে লক্ষ্য করে গায়–

'বাইদ্যা আমার ভালোবাসে না...
বাইদ্যা মারে আর হাসে

KvjxKvP : gwb‡Ii gv_vi Lwj wb‡q Kvjxi g‡Lvkavix `B ci"‡Ii Zievix h×

কিছু কই না তরাসে
আমার ভাই নাই রে দ্যাশে॥'

বাইদ্যা নিজেও বাইদ্যানীদের সঙ্গে নেচে বৃত্ত তৈরি করে ঘোরে। নাচের মধ্যে সামান্য দৌড়ে তারা একবার বৃত্তের কেন্দ্রের দিকে ঝুঁকে পরক্ষণেই পায়ে পায়ে তাল ঠুকে বাইরের দিকে বেরিয়ে আসে। দেখি তাদের নৃত্যের ছন্দময় সেই কাব্য ভঙ্গিমা। তাদের নাচে-গানে যন্ত্রসঙ্গত করে উঠানে বসে আরো কয়েকজন। তাদের কেউ হারমোনিয়াম, কেউ মন্দিরা, কেউ বা খোল বাজায়। তাদের সঙ্গে একজন গায়েনও থাকে। সে-ই তো বিচিত্র সুর-ছন্দে গেয়ে চলে- 'বাইদ্যা আমার ভালোবাসে না...'। তার সঙ্গে দোহার হয়ে বাইদ্যানীরাও গায়- 'বাইদ্যা আমার ভালোবাসে না...'। বাইদ্যা নাচের আরো দু-একটি গানের কথা হচ্ছে–

'আমার বাইদ্যা জাতির এই তো রীতি
ঘর ছাড়িয়া বাইদ্যার নৌকায় বসতি॥...'

এবং আরেকটি গানের কথা হচ্ছে–

'বিধি আমায় চিনো নি
দুদিনের পরে আইলাম আমি
ই তো বাইদ্যানী॥'

উঠানে আমাদের আগমনে ও মুগ্ধতায় বাইদ্যা নাচ একটু সময় নিয়েই চলে। হঠাৎ একজন নৃত্যক বাইদ্যানী আমার দিকে ছুটে আসে এবং তার দুই বাহু দিয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরে তার বুকের কাপড়ে সেপটিপিনে গাঁথা টাকা দেখায়। আমি পকেট হাতড়ে দশ টাকার একটি নোট তার হাতে তুলে দিতেই সে খুশি হয়ে নেচে নেচে অন্যদিকে ছুটে যায়।

বাইদ্যা নাচের দল এবার এ বাড়ি ছেড়ে অন্য বাড়ি যায়- আমরাও তাদের সঙ্গে যাই। সে বাড়ির নাচ-গান শেষে বাইদ্যা নাচের দল আরেক বাড়ি যায়। যতক্ষণ সূর্যের আলো থাকে ততক্ষণ এই বাইদ্যা নাচ বাড়ি বাড়ি ঘুরতে থাকে। এরপর সন্ধ্যা হলো। বাইদ্যা নাচ শেষ হলো। এবার সন্ধ্যায় হর-গৌরী পূজা মন্দিরের সামনে কবিতা শুরু হয়। এ এক অদ্ভুত কবিতা- ঢাকের চটাঙ চটাঙ শব্দের তালে একজন মুখস্থ প্রচলিত পুরাণকথা ছন্দে ছন্দে, ধীর লয়ে গেয়ে চলে, সঙ্গে থাকে দোহার- যার নাম কবিতা। কবিতার এমন প্রত্যক্ষ ধরন দেখতে মন্দিরের সামনে যেতেই কবিতাপাঠক আমাদের কানের কাছে এসে ঢাকের চটাঙ চটাঙ শব্দের সঙ্গে রামায়ণ পড়তে শুরু করেন। কিন্তু ঢাকের চটাঙ চটাঙ শব্দের সঙ্গে আমাদের কানে রামায়ণের পবিত্র বাক্য প্রবেশের পথে খেই হারিয়ে ফেলে। আহ! আমাদের কানের কী যে দশা! কেননা, ঢাক আমাদের কানের কাছে এনে তারা অনবরত ঢাকের কাঠি দিয়ে ঢাকেরই টান টান চামড়া পেটাতে থাকে...। কী তীব্র শব্দ রে বাবা! এই বুঝি কানের তালা ফাটে। কিন্তু তারা তো কিছুতেই বোঝে না- আমাদের কানের কী অবস্থা! কবিতার পর শুরু হয় ডুগনি- এখানে পুরাণকথার ছন্দগীতির ঢাক বাদ্যের সঙ্গে সামান্য নাচ যুক্ত হয়। এভাবেই কবিতা-ডুগনিতে সন্ধ্যা অতিক্রান্ত হয়ে যায়। শুরু হয় অন্য এক আখ্যান পর্ব, যার সঙ্গে পূজার চেয়ে কৃষকের চাষ-বাসের সম্পর্ক-ই বেশি বলে মনে হয়। তার নাম বীচট।

### এক রাতেই এক বছর

মন্দিরের সামনেই শুরু হলো বীচট বা বীজ বোনা। প্রথমে একজন গামছা পরনে গামছা কাঁধের হাইলা (কৃষক) পিঁড়িতে আসন হয়ে বসে যায়। তার মাথায় চাপিয়ে দেওয়া হয় এক ধামা ধানবীজ। সে দু হাতে ধানের ধামাটি কিছুক্ষণ মাথার উপরে ধরে রাখে।

এবারে মন্দিরের পূজাকার্যের গোছদার– সঞ্জিমা এসে অনেকগুলো বেতের লাঠি বাম বগলে চেপে রেখে হাইলার পেছনে দাঁড়িয়ে ধামার ধানবীজকে দুহাতে আগলে ধরে। কিছু সময় সাঞ্জিমা চুপচাপ কী সব ভাবে, দেখলে মনে হয় সে যেন অন্তরে কোনো মন্ত্র পড়ে। এর

মধ্যে ধামাটার মাথা ধরে কাত করে ধামাটাকে ঘোরাতে থাকে। এতে করে হাইলার চারদিকে ধামার ধানগুলো সব ছিড়িয়ে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির ছোট ছোট প্রাণবন্ত বা চারা সশব্দে যথাক্রমে– লাঠি হাতে বাওই (বাবুই) তাড়ায়, লাঠি ফেলে ফসল কাটে, ফসল মাড়াই করে এবং সেই ফসল গুছিয়েও দেয়। হাইলা এবার ফসল ভাগ করে। ভাগপর্বের প্রথমেই হাইলা তার ফলানো ফসলকে দু ভাগ করে এক ভাগ লুকিয়ে রাখে। আর অন্য ভাগ ফসলকে সে আবার দু ভাগ করে এবং বলে- 'এর এক ভাগ তার আর অন্য ভাগ শিবপূজার।' তার এক থার পর পূজার ফসল সাজ্ঞিমা ধামায় করে মন্দিরে তুলে নেয়। এভাবেই ধান তোলা পর্বের সমাপ্তি হয়। কিন্তু বীচট পর্বের তখনো অনেক বাকি। নতুন বছরের আগমনে হাইলারা এবার গণক ঠাকুরের শরণ নেয়–

: আরে ও গণক...।

তাদের ডাকে গণক ঠাকুর আসে গামছা পরনে, সাদা জামা গায়ে, কুষ্টার দাড়ি মুখে, গরুর দড়ির পৈতা কাঁধে, হাতে একগাদা কাগজ নিয়ে, খালি পায়ে। গণক ঠাকুর বাড়িতে এলেই হাইলারা তার পরিচয় জানতে চায়। ঠাকুর সে কথার বড় অদ্ভুত জবাব দেয়।

: আপনের পরিচয়?

: পরিচয়?

: হ হ।

: আমি আইটার গণক
কথা বড় টনক
রাম গণকের ভাই
মিথ্যা কথা ছাড়া আমার কাছে সত্য কথা নাই...

: আইচ্ছা গণক ঠাকুর, আমাগোর বীচট আর গুন্‌চা...

: ও, গুন্‌চা দেখন লাগবো?

: হ।

: পয়সা তো লাগবো।

: পয়সা দেমু...

: পাঁচসিকা দিতে হবে। পাঁচসিকা দিলে আমি সবকিছু দিতে পারবো...

: এই যে পাঁচসিকা...

গণক ঠাকুরের হাতে পয়সার পরিবর্তে টাকা হাত তুলে দেওয়া হলো। গণক সে টাকাটি কোমরে গুঁজে সঙ্গের কাগজপত্র খুলে উঠানে বসে পড়ে। শুরু হয় তার গণনাকর্ম। শুরুতে গণক বলে ওঠে–

: দয়াল রে, তুমিই জানো।

তার কাগজপত্র ঘাঁটা গণনার মধ্যে হাইলাবাড়ির লোকজন তার সঙ্গে কথা কয়। গণক তাদের সেসব কথার উত্তর দেয় ছন্দে ছন্দে। গণনার সময়ে একজন প্রশ্ন করে-

: ঠাকুর মশায় পৈতা কেন কান্দে (কাঁধে)?

গণক ঠাকুর ছন্দে তার উত্তর করে–

: আমি বামন, আমি হইচি এই চান্দে।

হাইলা বাড়ির লোকজন এবারে গণকের উত্তরে বেশ মজা পেয়ে যায়। তাই তারা আরো কথা কয়। গণক আগের মতোই তার ছন্দ



wkï‡`i‡K Mi“ mwR‡q Kwl Kv‡Ri Awfbq

জবাব দিতে থাকে।

: এইটা এতো কালা ক্যা?

: অ্যা?

: নগুন (পৈতা) এতো কালা ক্যা?

: বারো বছরে চান করে কোন হালা।

: আইচ্ছা যাগ্‌গে, আমাগের বীচট আজগে...

: ও, বীচটের দিন আজগে... সাংঘাতিক দিন...

গণকের গণনা শেষে হাইলার দরকার পড়ে ব্রাহ্মণ ঠাকুরের। হাইলারা এবার ব্রাহ্মণ ঠাকুরের কাছে হালের গরু চায়। কেননা আজকে তাদের বীচটের দিন, আজকেই চাষ দিতে হবে, ফসল বুনতে হবে। আসে ব্রাহ্মণ ঠাকুর। হাইলারা তার কাছে এগিয়ে যেয়ে বলে–

: গুরু ঠাকুর, আপনার কাছে গরু আছে না?

: হই, আমি ব্রাহ্মণ মানুষ গরুর ব্যবহার করি না...

: তবু আমাগের গরু দিতে হবে।

: কয় জোড়া গরু লাগবো?

: দুই জোড়া।

: দুই জোড়া গরুতে টাকা লাগবো অন্তত নিচের দেট টাকা...

: তাই দেমু...

: টাকা আমার আগে দিতে হবে।

: গরু না দিয়াই?

: টাকা দিলেই গরু দেওয়া হবে।

: এই যে টাকা।

হাইলার টাকা নিয়ে ব্রাহ্মণ ঠাকুর গরুর প্রতীক হিসেবে গরুর ভূমিকায় অভিনয়কারী একদল শিশু-কিশোরকে হাল কাজের জন্যে দিয়ে যায়। কিন্তু টাকার বিনিময়ে গরু কেনার পর হাইলা যখন হালচাষ করতে যায়, তখন দেখে, গরু জোড়া হাল টানতে পারে না। বারবার শুয়ে পড়ে। কাজেই হাইলা এবার ঠাকুরকে চেপে ধরে কিন্তু ঠাকুর তখন মিথ্যে বলে–

: আরে কী গরু দিছো?

: আমি গরু দিছি? এইটা কোনো কতা হইল? আমি হিন্দু মানুষ, গরুর কোনো ব্যবহার করি নাকি?

: গরুর ব্যবহার করো।

: হই, আমি ব্রাহ্মণ মানুষ, আমি গরুর ব্যবহার করি না।

: কিয়ের হালের গরু দিলে, হাল তো যায় না- এ কেমুন গরু বেচলে!

: আমি গরু বেচি কেডা কয়চে? গরু যদি আমি বেচতাম... এই ইয়ের মুদ্দে (মধ্যে) কি আছে হিন্দুরা কোনোদিন গরুর ব্যবহার করে?

: আছে না, আবার করেও তো...

: এইটা কোনো কথা হইল!

: কথা ঠিকই... এখুন গরুর কী ব্যবস্থা... সেটাই করন লাগবো...

এমন সময় দূর থেকে গোয়াল ডেকে ওঠে 'গো'। সঙ্গে সঙ্গে হাইলা তখন তাকে ডাকতে থাকে–

: এই যে এদিক আইসো।

গোয়াল হাইলার ডাকে এগিয়ে এলে হাইলা তাকে বলে

: গরুর কী হয়চে দেখন লাগবো...

গোয়াল গরুর গায়ে, হোলে, লেজে হাত দিয়ে গরু দেখে। সে সময় গরুর ভূমিকায় অভিনয়কারী শিশু-কিশোররা গোয়ালকে লাথি ছুড়ে মারে। এতে করে তাদের পায়ে বাঁধা নূপুরে রুমঝুম শব্দ হয়। গোয়াল ভালো করে গরু দেখে বলে-

: গরুর তো ব্যাঙ্গা হইছে।

: ব্যাঙ্গার ওষুধ দিওন লাগবো।

: পাঁচসিকা লাগবো।

: পাঁচসিকা দিবো, গরু যেন ভালো হয়।

গোয়ালের চিকিৎসায় গরু ভালো হয়। হাইলা চাষ দেয়। এখানেই শেষ হয় বীচট পর্ব।

এ পর্বের পর হনুমান ছুটে আসে। সে এত দিন আমগাছের পাহারায় ব্যস্ত ছিল- আজ হলো আম ভাঙানি... হনুমানের কাঁধে আনা আমডাল থেকে আম ছিঁড়ে নেয় অনেকেই। চৈত্রের আজ শেষ রাত-বৈশাখের প্রথম দিনেই খাওয়া হবে আম-ডাইল... হনুমান ছুটে চলে যায়।

মুক্তিপদ নিয়ে জাইলা আসে। সে তার পানি ছিটানিতে সন্ন্যাসদের মুক্তি ঘটায়- সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় গান-নাচ, সে যে মুক্তির উৎসব। রাত যত বাড়ে মানুষের চেহারায় ক্রিয়াকর্মে ততই উন্মাদনা ভর করতে থাকে। কেউ ঠাকুর স্নানে কুমে (ছোট জলাশয়) চলে যায়...।

অস্ত্রের ধার পরীক্ষা হয়... তার ওপর পা রেখে মন্দিরের দিকে ঝুঁকে পড়ে অনেকেই। কেউ ছুটে যায় চিতা নিমন্ত্রণে শ্মশানঘাটে।

এর মধ্যে শুরু হয় কুচকি বানাম। পেটের দু পাশের চামড়ার ভেতর ত্রিশূল ঢুকিয়ে ত্রিশূলের মাথায় নারিকেলের ছোবা পেঁচিয়ে আগুন ধরিয়ে ঢাকের তালে ধূপের ছিটা মেরে মেরে আগুনের ধপ্ ধপ্ শিখার সঙ্গে নাচতে থাকে অনেকেই। এর নাম কুচকি বানাম বা পাশ বানাম বা পাশ পঞ্চম।

বানাম শেষে রাতের উঠানে আগুনের থালা হাতে পরী নেমে আসে...। ঢাকের শব্দের তালে সে লাফিয়ে নাচতে থাকে আর কয়েকজন লেড়শব তাকে সর্বদা ঘিরে থাকে। পরীর উন্মাদনা ক্রমাগত বাড়তে থাকে...নাচের মধ্যে সে যেন বা দিশা হারিয়ে ফেলে... কাঁপতে কাঁপতে সে পড়ে যেতে গেলে তাকে ঘেরা লোকগুলো তাকে আগলে ধরে... শুনি, তার ওপর সত্যি সত্যি পরী ভর করেছে। নারীরা তালপাখায় বাতাস করতে করতে তার মুখোশ এবং শাড়ি খুলে নেয়- সে তখন দিব্যি পুরুষ...। পরীনাচ শেষে হঠাৎ করে মন্দিরের সম্মুখ থেকে ঠাকুরসহ অনেকেই ছুটে বেরিয়ে যায় পার্শ্ববর্তী মাঠের মধ্যে।

*KPwK evbv‡gi Av‡M †c‡Ui `B cv‡ki Pvgovq wÎkj dwU‡q †`qv n‡"Q*

## মইন জাগানো

মাঠের কাঁচা মাটিতে মৃত মানুষের মাথায় খুলি রেখে শুরু হয় মইন জাগানো। শোনা যায়– খুলিটা কোনো পুণ্যবান মানুষের। আজকের রাতে তার আত্মাকে ডাকা হচ্ছে- তার-ই খুলিতে পূজার ফুল ছিটিয়ে বা পূজা করে। মাঠের মধ্যে অন্ধকারে হ্যাজাকের আলোয় মইন জাগানোর ক্রিয়াকর্ম অদ্ভুত এক মায়া তৈরি করে। মনে হয় আমরা এ সময়ের কেউ নই... সম্পূর্ণ আদিম এক জমানায় পৌঁছে গেছি...। আমাদের সামনে ঠাকুর দু হাতে খুলিটাকে মাটিতে আগলে ধরে আছে, আর একটি লোক তার মুখোমুখি গড় হয়ে বসে উন্মাদের মতো খুলিটাকে বারবার প্রণাম করতে থাকে। অন্য একজন লোকটার প্রণামের হাত দুটির মধ্যে বারবার ফুল গুঁজে গুঁজে মন্ত্র পড়তে থাকে। লোকটার প্রণাম-ক্রিয়াতে উন্মাদ ভাব ক্রমাগত বাড়তে থাকে। এক পর্যায়ে মনে হয়, এখনই সে মাটিতে লুটিয়ে পড়বে এবং ঠিক তা-ই হয়। লোকটা খুলিটার ওপর লুটিয়ে পড়ে আর কয়েকজন লোক তাকে উচ্ছে তুলে ধরে দৌড় দেয় মন্দিরের দিকে। খুলিটা আটকে থাকে প্রণামকারীর বুকে। কিন্তু তারা মন্দিরের সামনে পৌঁছলে খুলিটা ঠাকুরের কাছে চলে যায়।

এবারে অন্য বাড়ির অন্ধকার থেকে দুটি কালীমূর্তির আবির্ভাব ঘটে। তাদের এক হাতে তরবারি অন্য হাতে মাটির বড় টাকনিপাত্র। তাদের একজন ঠাকুরের কাছ থেকে খুলিটাকে ছিনিয়ে নিতেই শুরু হয় দুই কালীমূর্তির পরম যুদ্ধ...। ঢাকের বাদ্যের সঙ্গে তাদের যুদ্ধ চলতে থাকে। যুদ্ধের চারদিকে মশাল জ্বেলে পাহারা

*KPwK evbvg : †Kvg‡ii Pvgovi wfZi †M‡_ ivLv wÎk‡ji gv_vq ac Av¸b wb‡q bZ¨*

দেওয়া হয়। ধারালো তরবারি মশালের আলোয় ঝিলিক কাটতে থাকে। যুদ্ধে তারা সমানে সমান। আমাদের মনে হয়- মা কালী তাণ্ডব বা রুদ্ররূপে পৃথিবীতে আবার নেমে এসেছেন... তার আরো মাথা চাই... কেননা এ জগতের নিষ্ঠুরতায়, অশুভ আর অন্যায়কারী নরমুণ্ড গলে আবার তিনি মঙ্গল সাধন করতে চান- মানুষের তরে।

যুদ্ধে তারা কেউ কাউকে পরাস্ত করতে পারে না। বরং কালীর মূর্তির ভরক্রিয়ায় তারা তাদের নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলতেই ঘের দেওয়া মানুষেরা তাদের আগলে ধরে। এর নাম 'কালীকাচ'। কালীকাচ শেষে একদল গঙ্গা আনতে যায়। সব শেষে হাজরা চলে। ঢাকের বাদ্যের শ্মশানে তখন আরেক উন্মাদনা। সেখানে সবাই যেতে পারে না। কেননা, সেখানে যেতে মানা। এইসব শেষ হলে রাতের পথ হেঁটে আমরা শেওড়াতৈলের সঙখেলা দেখতে যাই।

## সঙখেলা

সঙখেলা দেখতে যাবার পথে ভাবতে থাকি– একদিন বসন্তপুর গ্রামে আমি নিজেই ছিলাম সঙের একজন। শেষবার সঙ সেজেছি মায়ের সঙ্গে। মা ছিলেন ডুগডুগি হাতে বানরওয়ালা আর আমি ছিলাম শিকলে বাঁধা চঞ্চল বানর। বারবার জিভ বের করা, চোখ পিটপিট করা আর চটাং চটাং করে লাফিয়ে-ঝাঁপিয়ে প্রতিবেশীদের আনন্দ দেওয়াই ছিল আমার কর্ম। এই কাজ করতে গিয়ে নিজের হাঁটুর কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখি মহা সর্বনাশ- আমার হাঁটু দুইখান ছুলে হা। কী আর করা- সঙ সাজবার খায়েস মিটে গেল। ক্ষত নিয়ে ভুগতে হলো বেশ কিছুদিন। তখন সম্ভবত সাত কেলাসের ছাত্র ছিলাম। আমাদের পাড়ায় বিয়ে বা খৎনার অনুষ্ঠান হলেই সঙ সাজবার চল ছিল। সেই সূত্রেই মায়ের সঙ্গে প্রায় প্রায়ই আমিও সাগ্রহে সঙে অংশ নিতাম।

সঙখেলা বা সঙযাত্রা দেখতে যাবার পথে বারবার সেই কথাগুলো মনে পড়ছিল। অনুমান করছিলাম আমাদের করা সেই সঙের সঙ্গে টাঙ্গাইলের একটি নাট্যরীতি সঙ- যাত্রার বিস্তর ব্যবধান নিশ্চয় আছে। কাওয়ালজানি গ্রামে সঙের আসরে বসে সেই ব্যবধানের সুস্পষ্ট প্রমাণ মিলেছে। আমাদের করা সঙের মতো নিছক মজা করা টাঙ্গাইলের সঙকর্মীদের একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। সঙকর্মীরা সঙের মাধ্যমে সামাজিক মানুষের অসঙ্গতিপূর্ণ আচরণগুলোকে ব্যঙ্গ বা হাস্য-কৌতুকের ভেতর দিয়েই সমালোচনা করে থাকেন। সারা রাত চলে সঙের আসর। সঙের একটি আসরে একাধিক বিষয়ভিত্তিক আখ্যানের তাৎক্ষণিক বা পূর্বপরিকল্পিত অভিনয় উপস্থাপন করা হয়।

কাওয়ালজানি গ্রামে গত চৈত্রসংক্রান্তিতে সঙখেলা শুরুর আগেভাগেই দলের মাস্টার হরিপদ সরকার জোড় হাতে ঘুরে-ফিরে চৌদিকে বসা দর্শকদের কাছে ভুলভ্রান্তির আগাম ক্ষমাভিক্ষা চান। তাঁর ক্ষমাভিক্ষার পর শুরু হয় হারমোনিয়াম, ঢোল, করতালের সমন্বিত বাদন। এই বাদনের মধ্যে দর্শকসারির মেয়েরা উলুধ্বনি দিয়ে ওঠেন। তাদের সেই উলুধ্বনি আর যন্ত্রীদের বাদ্যের মিশ্র আবহের পরপরই আসে ফ্যামিলিদের বন্দনাগীত। এই দলে যে ছেলেরা মেয়ের সাজে অভিনয় করে, তাদেরকে ফ্যামিলি বলা হয়। চারজন ফ্যামিলি প্রথমে পূর্ব দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে ধীরলয়ে বন্দনা শুরু করেন–

আমরা পুবেতে বন্দনা করি গো মা
মা গো পুবে ভানুশ্বর।
একদিকেতে উদয় ভানু চৌদিকে আলো ॥
আমরা দক্ষিণে বন্দনা করি গো মা

মা গো ক্ষীর নদী সাগর।
যেই সাগরে চালায় ডিঙ্গা চান্দু সওদাগর॥
আমরা পশ্চিমে বন্দনা করি গো মা
মা গো নবীজীর রওজায়।
তাহারও চরণে জানায় হাজার সালাম॥
আমরা উত্তরে বন্দনা করি গো মা
মা গো কৈলাস পর্বত।
যেই পর্বতের হাওয়ায় গলে এই দেশের পাথর॥
আমরা চৌদিকে বন্দনা করি গো মা
মা গো মধ্যে করলাম স্থান।
মন দিয়া শোনবেন সবাই সঙখেলার গান॥
আমরা স্বর্গেতে বন্দনা করি গো মা
মা গো স্বর্গের দেবগণ
পাতালে বন্দনা করি মনসার চরণ॥

ফ্যামিলিরা এই বন্দনা গেয়ে আসর থেকে বেরিয়ে আসে। এবারে শুরু হয় সঙখেলার মূল পরিবেশনা। সারা রাত ধরে বেশ কিছু আলাদা আলাদা কাহিনীর পরিবেশনা চলে সঙখেলাতে।

এই সঙখেলার একটি কাহিনীতে দেখা যায়,

*mO‡L jvq cvQvq ewZ wb‡q wf¶vi `k¨*

ছেলে বাবার কাছে লজ্জায় বিয়ের কথা বলতে পারে না। খালি আমতা আমতা করে। কিন্তু বিয়ের কথা সে কিছুতেই বলতে পারে না। শেষ পর্যন্ত বাবা ছেলের মনের কথা বুঝতে পারে। এবং ছেলের বিয়ের জন্য পাত্রী খুঁজতে বের হয়ে বাবা নিজেই বিয়ে করে আনে। ছেলে এবার নিজেই নিজের বিয়ের জন্য বের হয়। কিন্তু ছেলে যাকে বিয়ে করে আনে- সে হচ্ছে বাবার বিয়ে করা বউয়ের আপন মা। কাজেই সম্পর্কে ছেলে হয়ে যায় বাবার শ্বশুর।

এবারে সেই সঙখেলা পরিবেশনার একটি আখ্যানের পুরো অংশ হুবহু তুলে দিচ্ছি-

: বাবারে বাবারে...।

: এই বাবারে বাবারে করবা না... তোরে খুঁজতি খুঁজতি আমার চোক একেবারে ঘুলা হয়ে গেছে গা...এই কই আছিলি?

: কাম-কাজ করতি করতি ভুইলা গিছি গা বাবা...।

: কাম-কাজ করতি তুই ভুইলা গিছিস গা!

: হ'...এই এই...

: এই রকম মিছা কতা কস ক্যান...কোন ক্ষ্যাতে কাম করছোস...?

: এট্টাও না।

: এই দেখেন- কইলাম কাম-কাজ করতি...অহনও এট্টা ক্ষ্যাতেও যায় নাই...এই কোনে আছিলি?

: এই না...আমার না...এই না...এই বাবারে...।

: কী হয়ছে-ভাইঙ্গা বুললেই না আমি বুঝতি পারি।

: এই না...এই না...বাবারে...।

: আরে কী হয়ছে বলবি তো।

: ভালো লাগে নারে বাবা।

: আরে ভালো লাগে না ক্যান? ক কী হয়ছে-তোর কি সদ্দি-জ্বর হয়ছে?

: না, সদ্দি লাগে নাই গা।

: তে কী হয়ছে- মাথা বিষ করে?

: ভালো লাগে না।

: ভালো লাগে না- তাহলি আমি দাঁড়া ডাক্তারখানা থিকে ভিটামিন আইনে দিই...তুই সুস্থ হোবি গা।

: ওতি ভাল হোবি নারে বাবা...।

: কী খাইলি তাহলি ভাল হোবি...?

: এই না... এই না... বাবা রে... এই না...

: কি হয়ছে বলবি তো...

: এই না... এই না...জানস না বাবা তুই...।

: আরে আমি জানলে তে কইতাম-ই... এই কি হইছে...?

: বাবারে...।

: ক' কী হয়ছে তোর...?

: বাবারে...।

: আচ্ছা, তোরে বিয়া করাতি হোবি আমি বুঝছি...।

: বাবারে-ইস্‌রে- বুঝছোস বাবারে...।

: আমি তোরে বিয়া করামুনে...একটা কাম-কাজ দেইখা করস না...পরের একটা মেয়ে যুদি ঘরে আনি তাহলি...।

: আমি সব করবো রে বাবারে...হায়রে যেই কতা মোর মনে ছিল বাবা- সেই কতা তোর মনে হয়ছেরে বাবা...।

: ঠিক আছে, তুই বাড়ি থাক- কয়দিন ঠিকমতো দেখাশুনা করবি- আমি তোর জন্যি সুন্দোর দেখে একটা পাত্রী দেইখা আসি গা...তাহলি কাম-কাজ দেখে করবি তো...।

: ঠিক আছে বাবা... ভেড়া-ছাগল সব দেকে রাকবো নে...

: এটা কতা শোন... এই ইলাকা ছা'ড়ে যাবি না... গরু-বাছুরির ঠিক মতো পানি খাতি দিবি...

: বাবারে তুমি আগে যাওরে- পরে ব'লোনে কামের কতা...।

: ঠিক আছে যাচ্ছি...।

: তাড়াতাড়ি আসিসরে বাবারে...।

বিয়ে- পাগলা ছেলের জন্য বাবা পাত্রী দেখতে বের হয়। বাবা ছেলের জন্যে পাত্রীর খোঁজে এক বাড়িতে যেয়ে হাজির হয়ে দুয়ারে দাঁড়িয়ে বলতে থাকে–

: বাড়িতি কোনো লোকজন আছেন গো...

: আছি...আপনি কিডা?

: আমারে আপনি চিনবেন না।

: কেন আইছেন?

: আইছি একটা শুভ কাজ উপলক্ষে...

: কী শুভ কাজ?

: শুভ কাজ হলো আমার একটা ছেলের বিয়া করান লাগবো-

: পাত্রী দেখছেন কোথাও

: পাত্রী দেখি নাই, তবে আশা আছে... আপনাদের এই গিরামে নিশ্চয় কোনো পাত্রী আছে...

: পাত্রী তো আমার একটা মেয়েই আছে।

: আচ্ছা ঠিক আছে... আপনি মেয়েটাকে আমাকে দেখাইতে পারেন?

: হ, দেখাইতে পারি... আপনি যদি দেখেন... তাইলে আপনি ইট্টু ভিতরে আসেন।

: আচ্ছা ঠিক আছে... আমি ভিতর আইতাছি...

ঘরের ভিতরে ঢোকার অভিনয় না করেই ভিতরে ঢোকার ইঙ্গিত প্রকাশার্থে খুবই স্বাভাবিকভাবে স্থান পরিবর্তন করে বাবা এবার মেয়েটার দিকে তাকিয়ে বলে–

: মেয়ে তো দেখতে-শুনতে বেশ ভালই তাই না- আচ্ছা তুমি লেখা-পড়া করছো?

: কিছু করছি?

: আচ্ছা তুমার নামটা কী?

: নাম হল সন্ধ্যারাণী...

: সুন্দর নাম... তাইলে সন্ধ্যাবাতি জ্বালাতি তো তুমার আর ভুল হইবো না... তুমার নামই তো সন্ধ্যারাণী...

: আচ্ছা...আপনের পছন্দ হইছে?

: হ... অবশ্য আমার পছন্দ হইছে...

: পছন্দ হইলে তো আমাদের দ্যাশে নিয়ম আছে...

: কী নিয়ম আছে?

: কেউ যদি মেয়ে দেখতি আসে... মেয়ে যদি তার পছন্দ হয়... তবে তারেই বিয়ে করে যাইতে হয়।

: এটা একটা সম্ভব কতা নাকি... আমি পাত্রী দেখতি আইছি আমার ছেলের জন্যি...এই নিয়ম কত্দিন তে...

: অনেকদিন থেকে...

: তাহলে আমারেই করন লাগবো বিয়ে?

: হ... আপনারেই করন লাগবো...

: না, এটা সম্ভব না।

: সম্ভব করতে হবে।

: আচ্ছা এখন কি আর করন যাইবো... আপনাদের দ্যাশের আইন যখন...

বাবা এবার বিয়েতে সম্মতি দেয়। সঙ্গে সঙ্গে বাদ্যযন্ত্রী দল বিয়ের বাদ্য বাজাতে শুরু করে। সে সুর আমাদের পরিচিত সুর– 'মালকাবানুর দ্যাশেরে বিয়ের বাদ্য আল্লা বাজে রে...'। এই বাদ্যের মধ্যে বাবা তার পাঞ্জাবির পকেট থেকে সাদা রঙের রুমাল বের করে পাত্রীর গলায় তুলে দেয়। আসরের দর্শকসারি থেকে ভক্তনারীরা তখন উলুধ্বনি দিয়ে ওঠে। সঙের বিয়ে এভাবেই সম্পন্ন হয়।

বিয়ে করার পর বাবা এবারে তার একটি ছোট আত্মকথন করে। এই কথার কিছু অংশ দর্শকদের উদ্দেশে, কিছুটা কাহিনীর দৃশ্য পরিবর্তনকে ইঙ্গিত করে বলা–

: ছেলের জন্যে মেয়ে দেখবার লাগি আইছিলাম...অহন দেশের আইন-প্রথার হিসাবে নিজিরই বিয়ে করতি হইল... অহন কী করন যাইবো...

এই পর্যন্ত বলে নিয়ে বাবা এবারে নববিবাহিত বউয়ের উদ্দেশে কয়–

: তোমার মায়ের ইট্টু আশীর্বাদ নিয়ে লও যাইগা... আর কি...

বউয়ের মা এগিয়ে আসতেই নববিবাহিত দম্পতি তার পায়ে প্রণাম করে এবং রওনা দেয়।

এই কাহিনীতে ছেলের জন্যে পাত্রী দেখতে গিয়ে বাবা নিজেই বিয়ে করে ফেলে। যার সঙ্গে যোগ করা হয়েছে অদ্ভুত এক দেশের কল্পনা– যে দেশের রীতি অদ্ভুত! কেউ পাত্রী দেখতে গেলে- পাত্রী পছন্দ হলে পাত্রীকে অবশ্যই বিয়ে করে আসতে হয়। কাজেই যে পাত্রীকে বাবা ছেলের জন্য পছন্দ করে সে পাত্রীকে বাবাকেই বিয়ে করতে হয়।

এদিকে পাত্রী দেখতে যেয়ে বাবার ফিরতে দেরি দেখে ছেলে বেশ অস্থির হয়ে নিজের মনে নিজে কথা বলতে থাকে–

: বাবা রে দুই দিন ধরে গেছ না বাবা রে...আহস নারে বাবা রে...

এর মধ্যে বাবা নতুন বউ সঙ্গে নিয়ে বাড়ি ফিরে আসে। ছেলে পিছন ফিরে হঠাৎ বাবাকে দেখে এবং বাবার পিছে নতুন বউ দেখে খুব খুশি হয়। ছেলে ভাবে, বউটা তার জন্যই নিয়ে এসেছে বাবা। ছেলে তাই নতুন বউয়ের দিকে এগিয়ে গিয়ে বলে ওঠে–



mO‡Ljvq †Q‡j hLb evevi kvïwo‡K we‡q K‡i Av‡b

: বাবা খুব খুশি হইছি রে বাবা...

: খুশি হওন যাইবো না...ভক্তি কর।

: ক্যা?

: এইটা তোর মা।

: কয় কী! না, এই আমার বউ- আর...

: এই, এইটা তো সম্ভব হয় না।

: এই, না না।

: এই শোন- জানস না তো তুই- আমি গেছিলাম তোর জন্য মেয়ে দেখতে...ওই দেশের প্রথা- রাজাই ঢোল দিয়া দেছে- যে মেয়ে দেখবার জন্য যায়, তারে বিয়ে করে আসা লাগবি...।

: হায় হায় রে, বাবা রে...তুই আমারে মারছোস রে- এত কষ্ট মোর পরানে সয় নারে।

: কী করন যাইবো।

: হায়! তোরে আমি জীবন ভরে কিয়ের বাবা কইলাম...হায় রে আমি পাড়ার মান্ষের বাবা কইলেও না আমারে দশ-পাঁচটা বিয়ে করাইয়া দিত...।

: কী করন যাইবো...।

: তুই কেনে আমার জন্যে মেয়ে দেখতে গেলি রে বাবা রে...মরছি রে...।

ছেলের পাগলামি দেখে তখন নতুন বউ বলে ওঠে–

: ছেলের তো মাতায় ছিট!

বাবা তখন বউকে বোঝায়-

: ছেলের মাতায় ছিট নাই। ছেলে তো বিয়ের উপযুক্ত হয়ে গেছে গা- অহন তুমার দ্যাশের আইন হিসেবে আমারে বিয়ে করে আসতি হোলো...।

এবারে ছেলে আবার আহাজারি শুরু করে-

: ক্যান সব্বোনাশে কাম করছোস বাবা...

বাবা ছেলের আহাজারি দেখে নতুন বউকে বলে-

: তুমি ওরে ইট্টু আদর করে থামাওগাচি...।

কথামতো নতুন বউ ছেলেকে থামাতে গেলে ছেলে বলে–

: এই তুমি সরো।

এবারে বাবা ছেলের কাছে গিয়ে বলে-

: অহন তো মনে কর গা- এ তোর মা...।

: অ্যার সব্বোনাশে কাম করছো রে- এতদিন ধরে ক্যানে বাবা কইলাম রে, অ্যা?

: তুই না-ইট্টু ভাল কতা ক'য়া তোর মা'রে ইট্টু সান্ত্বনা দে...।

: তুই খালি মা ক'য়া ধাপ্পা দিতি চাস।

ছেলের অবস্থা দেখে বাবা নতুন বউকে বোঝায়-

: অহন কী করন যাইবো- তাই না? অহন পুলার যা রাগ না... অহন তো কিছু কইতেও পারি না- যাই হোক না...তুমি তো ঘরে আয়ছো, তুমি এই ছেলেডার ভালো জ্ঞান দিয়ে ছেলেডার ইট্টু মাথাটাথা বাড়াইতে পারো...এইটাই কিন্তু তুমার কাছে আমি চাই...ও যুদি রাগের এট্টা কতাও কয় তুমি কো'ল বল না...।

: ঠিক আছে...।

বাবা আর নতুন মায়ের অনুপস্থিতিতে ছেলে এবার একা একাই বিয়ে করার কথা ভাবে এবং বিয়ে করতে বের হয়। শেষে বিয়ে করে বউ নিয়ে বাড়ি ফিরে আসে।

: বাবা একাই বিয়া করবা...আমি বিয়া করবাম না- আমার কি ক্ষমতা নাই- চিহারাই কম আছি না আমি! রাজার নাহাল চিহারা...পছন্দ করবো না- বাবারে মেয়ে দেখতে পাঠায়া ভুল করছিলাম...।

কোনো এক বাড়ির সামনে গিয়ে সে হাঁক ছাড়ে–

বাড়িতি আছ না কি গো কে-রোই...?

: কী-ডা আপনি?

: অ্যা?

: আপনি কী-ডা?

: বিয়া করবার আইছি।

: আপনার বাড়ি কোথায়?

: এই হয়ছে গো...বাড়িতি মর্দা মানুষ নাই?

: না- আমি একাই বাড়িতি।

: তে আমি যাই গা।

: না, যাওন যাইবো না, ভিতরে আসো- ভিতরে আসো।

: আ'সে গিছি।

: আপনি বিয়া করেন নাই?

: এই চিন্তাই তো মরলাম।

: বিয়া করবেন আপনি?

: পামু কোনে?

: আমি জুগাড় করে দিবুনি।

: দিবুনি...বাবাও করচে বিয়া...।

: আইচ্ছা একটা কথা বলি- আপনার তো কেউ নাই- আমারও কেউ নাই।

: আমার বাবাই আছে না।

: তা থাক অসুবিধা নাই, আমার কেউ নাই আমরা দুইজন যুদি স্বামী-স্ত্রী হয়ে যায়...

: বাড়িতি একাই শুয়ে থাকো? তে করো বিয়া...।

বিয়ে করে ছেলে বাড়ি ফিরে আসে। বাড়িতে ঢুকতেই বাবার সঙ্গে দেখা হয়।

: ও বাবা রে আমারও বরাত ভাল রে...।

: বরাত ভাল...তোর মা সারা রাত তোর নাগে খালি কান্দে।

: আমার মায় কান্দে- কয় কী? বাবা রে আনছি রে...।

: কী আনছোস?

পিছনে হেঁটে আসা বউকে দেখায়-

: এই যে দেক।

বাবার নতুন বউ ছেলের সঙ্গে আসা বউকে দেখে বলে ওঠে-

: ইডা তো আমাদের মার নাকাল দেকা যায়।

: ই' কয় কী?

বাবার বিয়ে করে আনা বউ অর্থাৎ ছেলের নতুন মা ছেলের বিয়ে করে আনা বউয়ের দিকে এগিয়ে এসে ভাল করে দেখে দেখে বলে–

: হ' হ'- এ তো আমাদের মা-ই।

বাবা তার শাশুড়িকে নিশ্চিতভাবে চিনে কুশল জিজ্ঞাসা করে–

: ভাল আছেন আপনি?

কুশল জিজ্ঞাসার সঙ্গে সঙ্গে বাবা নিজের শাশুড়ি ও ছেলের বউয়ের পায়ে হাত দিয়ে সালাম করে। ছেলে তখন নিজের পা এগিয়ে দিয়ে বাবাকে প্রণাম করতে বলে –

: আমারে আমারে...

: তুই তো আমার পোলা।

: ওইডা আমার বউ না... ওরে সালাম দিলি... আমারেও দেও...

: ওইডা তোর বউ হোবি কিয়ের নাইগা?

: আমারে আমারে ভক্তি করো... আমি তো শ্বশুর।

: শ্বশুর তো মারা গেছে ... আমি যখন বিয়া করছি তহন শুইনা আইছি...

*Po‡Ki gv‡V Kvjxgv‡Zi mvg‡b †Xvj‡Ki Zv‡j f‡³i bZ¨*

বাবা ছেলের বউয়ের সামনে গিয়ে দেখে সে তার শাশুড়ি। তখন বাবা তার কুশল জিজ্ঞাসা করে ও তার পায়ে সালাম দেয়। এ দেখে ছেলে নিজের পা বাড়িয়ে দিয়ে বাবার সালাম চাইলে বাবা বলে, 'তুই তো আমার পোলা।' আর ছেলে বলে, 'ওইটা আমার বউ না!' ছেলের কথার জবাবে বাবা বলে- 'ওইটা তোর বউ হোবি কীয়ের নাইগ্যা? শ্বশুর তো মারা গেছে...আমি যহন বিয়া করছি তহন শুইনা আইছি...।' বাবার কথার উত্তরে ছেলে বলে-

: শুইনা আইছো...অহন কী-ডা? অহন?

: অহন কী-ডা...! তোর কতার কিছু ব'ইল বুঝি না...।

: বোঝস না...আমি বিয়া করছি...।

: তুই বিয়া করলি আবার কোন তালে?

: তুই একাই বিয়া কইরা আইলা, আমি একাই কইরা আইবো না বিয়া...।

: এ আবার কেমুন তালের কতা কয়... তুমি তুমার মারে নিয়ে ভিতর বাড়ি যাও।

ছেলে এবার তার নিজের বউকে শুনিয়ে বলে-

: ভক্তি খালি তুমারে করলো- আমারে তো করলো না...

: অহন কী করবো...

: উনি তো ওর মা লাগে ... তোরে ভক্তি করবো কেমনে...

: আমারও তো বউ নাগে।

: এইডা কোনো কতা হইল নাকি...

: আমি কইছিলাম না... ছেলের মাথায় ছিট আছে...

ছেলে ও বাবার এই কথার মধ্যে ছেলের বউকে রেখে বাবার বউ এসে বাবাকে সান্ত্বনা দিতে চায়। কিন্তু সেদিকে বাবা বা ছেলের কিছু আসে যায় না। ছেলের জেদ হচ্ছে যে,– সে বাবার ভক্তি চায়। কেননা, বাবা শাশুড়ি হিসেবে ছেলের বউকে প্রণাম দিয়েছে। অতএব ভক্তি তার পাওনা, এমনকি বাবার কাছ থেকে শ্বশুর ডাকও ছেলের প্রাপ্য। তাই তো ছেলে বলে–

: আমারে কইবা না...শ্বশুর কইবা।

: তাই কি আর কওন যায়- তুই না আমার আদরের ছেলে!

এতক্ষণে বাবার কথায় ছেলে একটা মোক্ষম জবাব পেয়ে যায়-

: দেশে বিচার-আচার লাই- তুমি চার-পাঁচটা বিয়া করে আইলা- অহন আমি...আমার ক্ষমতায় করলাম না বিয়া...তুমারডা থেকে আমারডা বড়-ই আছে...।

বাবা-ছেলের বিয়েবিষয়ক আখ্যানটি এখানেই শেষ হয়। শেষে পরিবেশিত হয় দলের পরিচিতিমূলক একটি গান। গানটি দুজন ফ্যামিলি নেচে নেচে গাইতে থাকে-

ভালো শেহড়াতৌল গ্রামে সরস্বতী নামে আছে রঙতাম্সার গান।

রঙতাম্সার জন্ম বাবু রঙতাম্সার গ্রাম ॥

এই দলের ওস্তাদ আমার শ্রীচরণ সরকার ॥

এই দলের ম্যানেজার হয় নেপাল সরকার নাম।

এই দলের মাস্টার হয় মোর হরিপদ নাম ॥

এই দলের কমিক হয় মোর বলাই গোপাল শ্যামল নাম।

এই দলের ফ্যামিলি হয় রতন গোপাল নেপাল নাম ॥

সঙখেলার এই পালাটি দেখে কৃষ্ণপক্ষের মধ্যরাতে কাওয়ালজানি থেকে ভাদগ্রাম ফেরার পথে হরগৌরী পূজার সঙ্গে পালাটির সম্পর্ক নিয়ে ভাবতে থাকি। কারণ আসরটি ছিল হরগৌরী পূজা উপলক্ষে। ভাবনার সঙ্গে সঙ্গেই উচ্চারণ করি, আমাদের সামাজিক কিছু মানুষের অসঙ্গতিপূর্ণ আচরণ- হর অর্থাৎ শিব চরিত্রের মধ্যেও ভিন্ন মাত্রায় উপস্থিত ছিল। যেমন আমাদের দেখা পালাটিতে ছেলের বিয়ের জন্য পাত্রী দেখতে গিয়ে বাবার নিজেই বিয়ে করে

আনা- এই ব্যাপারটির মধ্যে যে অসঙ্গতি আছে হুবহু তেমনি না হলেও তার থেকে উৎকট একটি অসঙ্গতি শিব চরিত্রে দেখা যায়। শিব নিজের ঔরসজাত কন্যা পদ্মা বা মনসাকে দেখে রতিরসে মজে গিয়েছিলেন। হতে পারে দেবতার সেই অসঙ্গত আচরণ এবং বর্তমানে সমাজে বিরাজমান অসঙ্গতির মধ্যে গোপন কোনো ঐক্যের সূত্রেই আজকের সঙখেলা, যার ব্যাখ্যা সঙকর্মীদের কাছেও অজ্ঞাত।

সঙখেলা দেখে রাত পার করে পরদিন সকালে মানে বছরের প্রথম দিনে বা বৈশাখের প্রথম দিনে গ্রামের সবার সঙ্গে প্রথম আম খাবার সুযোগ হলো, সেই সঙ্গে বাড়ি বাড়ি আমের খাটা বা টক এবং আম দিয়ে রান্না করা পায়েস। এবার বছরের প্রথম দিনে স্নান-ধ্যান করে নগরভাদগ্রামের পথে পথে ঘুরি– বাউল পথচারী শিল্পী কাঙাল আলম এবং খোকা মামার গান শুনি। আর বিকালে ছুটে যাই চড়কের মাঠের দিকে।

## চড়ক

চড়কের আয়োজন হচ্ছে চরপাড়ার মাঠে। নগরভাদগ্রামের পার্শ্ববর্তী গ্রাম। আমাদেরকে যেতে হচ্ছে গ্রামের ধূলিওঠা পথ হেঁটে, মৃত নদীর ভাঙা সাঁকো পার হয়ে এবং গ্রাম্য পথের বাঁক ঘুরে মাঠের মধ্যবর্তী সরু পথ পেরিয়ে। পথপার্শ্বে গ্রামের শিশু-কিশোরেরা ক্রীড়ামগ্ন, পথপার্শ্বে ডিপটিউবওয়েল, দু-একটি বাড়ি, কলাগাছ। বাড়িগুলোর ছোট ঘরে পাটকাঠির বেড়া আর ওপরে ছনের ছাউনি। প্রতিটি বাড়ির পাশেই বুনো ঘাস-ফুল আর ঘাসের স্নেহ।

কিছুক্ষণ থেকেই আমাদের কানে মাইকের শব্দ ভেসে আসছে। এবার আমরা শব্দের অর্থহীনতা কাটিয়ে স্পষ্ট কথা শুনতে পাই– ‘আর কিছুক্ষণের মধ্যেই আপনারা দেখবেন মাত্র সাত বছরের একটি ছেলে পিঠে গাঁথা বড়শির ওপর ভর করে কীভাবে চড়কে ঘোরে- সেই আশ্চর্য ব্যাপার...সাত বছরের একটি ছেলের পিঠে গাঁথা বড়শির চড়ক দেখবেন আর কিছুক্ষণের মধ্যে...।’ আমাদের পায়ে দ্রুত গতি চলে আসে। দূর থেকে দেখি চড়পাড়ার বিস্তৃত একটি মাঠের মধ্যে ইলেকট্রিকের থামের মতো চড়কগাছ দাঁড়িয়ে আছে। আর সেই চড়ক ঘিরে অসংখ্য মানুষের জটলা। আরো মানুষ আসছে চারদিকের মাঠের পথ ভেঙে পড়ি-মরি করে।

আমরা চড়কের কাছাকাছি যেতেই দেখতে পাই, চড়ক উপলক্ষে বসে যাওয়া জিলাপি, চানাচুর, কদমা, দানাদার, বাতাসা, মিঠাইয়ের ছোট ছোট খোলা দোকান। তার সঙ্গে বাচ্চাদের শখের পুতুল, খেলনা-বাঁশি, খেলনা-ঢোল, একতারা, ঘড়ি- এসবেরও বিক্রয় স্থান হয়ে উঠেছে চড়কের একটি প্রাঙ্গণ। এই প্রাঙ্গণ পেরিয়ে সহসা আমরা চড়কের মূল মাঠে গিয়ে দাঁড়াই।



*চড়কের মাঠে মুখোশ মুখে সারা গায়ে পাটের আঁশ বেঁধে হনুমানজী*

চড়কের মাঠ- এক উন্মাদনার মাঠ। চড়কগাছকে কেন্দ্র করে একটি সদ্য চাষ দেওয়া বিস্তৃত মাঠে বৃত্ত তৈরি করে বৃত্তাকারে ঘিরে আছে রঙ-বেরঙের পোশাক পরা হাজারো মানুষ। মানুষের ঘের দেওয়া সেই বৃত্তের মাঠে বিশাল তরবারি হাতে রাবণের উন্মাদনাকে নিয়ন্ত্রণ করতে তার কোমরে বাঁধা দড়ি দুই পাশ থেকে দুইজন ধরে রয়েছে। রাবণের সাধ্য কী সেই দড়ির বাঁধন ছিন্ন করে কাউকে বা রাম সম্প্রদায়কে আক্রমণ করে! এ কী আশ্চর্য প্রহসন রাবণের দেশে আমরা রামকে দেবতা ভাবি আর রাবণকে ভাবি নিষ্ঠুর-অত্যাচারী! মধুসূদন দত্ত ভারতবর্ষে রামের ফাঁকিবাজি ধরিয়ে দিয়েও ভারতবাসীর বোধকে বদলাতে পারলেন না- হায় শ্রী মধুসূদন, হায় মেঘনাদবধ কাব্য! রাবণের অস্ত্রহাতের উন্মাদনা অন্য পাশে রামসুহৃদ হনুমানজি গাছের সবুজ পাতাসমেত দুটি ডাল হাতে কসরত করে চলেছেন। সারা দেহে পাটের পোশাক বেঁধে মুখে মুখোশ পরে একজন হয়েছেন হনুমান, অন্যজন সারা দেহে কালো রঙ মেখে- কালো হাফপ্যান্ট পরে বিশাল তরবারি হাতে হয়েছেন রাবণ। রামের প্রতিনিধি হনুমান আর রাবণের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতির সঙ্গে চলছে শিশুদের তীর-ধনুকের যুদ্ধক্রীড়া, এ যেন রাম-রাবণের যুদ্ধেরই প্রতীকী রূপ।

অন্যদিকে লাল ধুতি পরা এক ভক্তের প্রার্থনা-উন্মাদনা চলছে কালীমূর্তির সামনে। ভক্তের এই উন্মাদনাকে নিয়ন্ত্রণ করছে একজন ঢাকবাদক। তার ঢাকের শব্দে ভক্ত তার দেহ-প্রাণ-ভাঙা উথাল-পাথাল প্রার্থনায় সদ্য চাষ দেওয়া জমিতে গড়াগড়ি যায়- তাক ধিনা ধিন নাচতে থাকে- নাচের সঙ্গে দৌড় দেয়- পুনরায় ঢাকের বাদ্যে কালীপ্রতিমার পায়ে লুটিয়ে পড়ে। কালীপ্রতিমারও এখানে জীবন্ত রূপ-কালীর মুখোশ আর সাজবস্ত্রে একজন দাঁড়িয়ে আছে অস্ত্র হাতে-তার পায়ের নিচে কালীর স্বয়ং স্বামীবেশে আরেকজন শুয়ে আছে। অন্যজন কালীকে আগলে ধরে আছে এই জন্য যে, যদিবা ভক্তের প্রার্থনায় কালী সত্যিই জেগে ওঠে। তাহলে মহা সর্বনাশ!

এই চড়কে দুজন কালীর ক্ষেত্রেই একই রকম ঘটনা ঘটে। কালীমাকে এখানে পূজাও করা হয়- ঠাকুর বসে ধূপ-ধোঁয়ায়...ঘণ্টি বাজিয়ে...পুষ্প ছিটিয়ে...মন্ত্র পাঠে শাস্ত্রমতে কালী অর্চনা করেন।

কালী অর্চনা শেষে চড়কের মূল আয়োজন শুরু হয়। এই পর্বের প্রথমেই তীর-ধনুক নিয়ে



*Po‡Ki gv‡V R¨vš— KvjxgwZ cRvq ci"‡li g‡L Kvjxi g‡Lvk*

যুদ্ধক্রীড়ার শিশুদের মুখে বা চোয়ালের মাংসপেশিতে এবং জিহ্বায় লোহার শিক বিঁধে দেন 'হরে কৃষ্ণ হরে রাম'-এর কাপড় মাথায় বাঁধা শঙ্কর। শিশুরা তাদের জিহ্বা ভেদ করা এবং চোয়ালের মাংসপেশি ভেদ করা লোহার সিক কীভাবে বিঁধে আছে তা দেখাতে জটলা বাঁধা চারদিকের মানুষের সামনে দিয়ে চুপচাপ হেঁটে চলে যায়। দর্শক সবার সঙ্গে আমরাও অবাক!

Po‡Ki gv‡V †jvnvi wkK w`‡q Mvj wQ` K‡i †`qv n‡q‡Q

মূলপর্ব শুরু হবার কথা চড়কের মাইকে ঘোষিত হয়, 'এখনই দেখবেন সেই আশ্চর্য ব্যাপার...সাত বছরের ছেলে এই প্রথমবারের মতো চড়কে উঠবে।' আমরা মাইকে ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে সাত বছর বয়সের অসিতকে শনাক্ত করি- শনাক্ত করি তার বড় ভাই রতনের মাধ্যমে। রতন আমাদের কাছে এসেছিল হাতের ক্যামেরা আর রেকর্ডার দেখে। রতনের মাধ্যমে তার বাবা ক্ষিতীশকেও পেতে আমাদের কোনো অসুবিধা হয় না। রতন আগের বছর চড়কে ঝুলেছিল- এবারে ঝুলবে তার ছোট ভাই অসিত। অসিতকে জিজ্ঞেস করি ভয় করছে কি না? অসিত ভয়ে ভয়ে কম্পিত গলায় বলে- 'না।' 'তুমি কি নিজের ইচ্ছেয় চড়কে উঠছ?' অসিত কোনো উত্তর করে না। তার বাবা ক্ষিতীশ বলেন, 'ঠাকুরের ইচ্ছে...। আমি নিজেও চড়কে ঝুলিছি...আমার বড় ছেলে রতন গেল বছর ঝুলেছে...এই বছর এই আমার ছোট ছেলে অসিত পরথম।'

'যদি কোনো বিপদ হয়?'

'ঠাকুর আছে...।' কথা শেষ না করেই ক্ষিতীশ তার ছেলেকে নিয়ে চড়কের আয়োজনে ফিরে যান।

ততক্ষণে অসিত তার মায়ের কোল থেকে বিদায় নিচ্ছে...মা তার অঝোরে কেঁদে চলেছেন- অন্য নারীরা মাকে প্রবোধ দেওয়ার চেষ্টা করছে। কোনো প্রবোধেই মায়ের কান্না বাঁধ মানছে না। শেষ পর্যন্ত পিতা ক্ষিতীশ মায়ের কোল থেকে অসিতকে নিয়ে যায় আর মা তখন চড়কগাছের কাছে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে আরো অধিক আবেগে কেঁদে ওঠে। ঠাকুরের অনুরোধে অন্য নারীরা আবেগে কান্নারতা অসিতের মাকে দর্শক সারিতে ধরে নিয়ে যায়।

সাত বছরের অসিতকে তার পরনের হাফপ্যান্টের ওপরেই লাল এক খণ্ড কাপড় পরিয়ে দেওয়া হয়। অসিতকে শিখিয়ে দেওয়া হয় জোড়হাতে সবার কাছে ক্ষমা ভিক্ষার কথা। অসিত তা-ই করে- জোড়হাতে চারদিকে প্রদক্ষিণ করে সে ক্ষমা চাইতে থাকে। তার সঙ্গে সঙ্গ দেয় বয়স্কগোছের এক লোক। ক্ষমা ভিক্ষার পর অসিতকে চড়কগাছের কাছে এনে এবারে খেজুরপাতার পাটিতে উপুড় করে শুইয়ে দেওয়া হয়। এরপর বড়শি বেঁধার জন্যে অসিতের পিঠ মালিশ করা হয়। মালিশ শেষে পিঠের মাংসপেশি টেনে বড়শি গাঁথবার জন্য টিপে ধরে অসিতের বাবা ক্ষিতীশ- সঙ্গে সঙ্গে বড়শি বিঁধিয়ে দেয় হরিনাম মাথায় বাঁধা শঙ্কর।

Po‡Ki Rb¨ wc‡V eo wk we‡a †`qv n‡"Q

অসিতের পিঠে শিরদাঁড়ার দু পাশের মাংশপেশিতে একইভাবে দুটি বড়শি বেঁধানো হলে-বড়শির পেছনে বাঁধা পাটের দড়ি টান-টান করে পরীক্ষা করে অসিতেরই বাবা। আশ্চর্য কোনো রক্ত বের হয়নি অসিতের পিঠে বড়শি বেঁধার পরও! বড়শি বেঁধার সময় নকশি পাখায় অসিতকে বাতাস করা হচ্ছিল।

এবারে পিঠে বড়শি বেঁধা অসিতকে খেঁজুরপাটি থেকে তুলে দাঁড় করানো হয়। আরো আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে– পিঠে বড়শি বেঁধা শিশু অসিতকে নিয়ে মাঠভরা দশর্ক সারিতে ঘুরে ঘুরে অর্থ ভিক্ষা চলে বেশ কিছুক্ষণ। সারা ভিক্ষায় আসিতের মুখে তখন কান্না কান্না ভাব ফুটে থাকে। আর এই ভিক্ষাপর্বে অসিতকে সুস্থ রাখার জন্যে নকশি পাখার বাতাস কিন্তু থেমে থাকেনি, একজন লোক অসিতের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে তার পিঠে ও মাথায় বাতাস করতে থাকে। পিঠে বড়শি বেঁধা অসিতের ভিক্ষা সংগ্রহের স্টিলের থালাটি কাগজের টাকায় ভরে ওঠে। মাইকে তবুও ভিক্ষা দেবার জন্যে দর্শকদের প্রতি বারবার অনুরোধ ঘোষিত হতে থাকে। তখন আমাদের খুব করে মনে পড়ে যায়, হাট-বাজারে দেখা সেসব জাদুকরের কথা- যারা পেটের মধ্যে তরবারি চালানোর জাদু দেখিয়ে অর্থ সংগ্রহ করত বা কবিরাজি ওষুধ বিক্রি করত। আর পেটে তরবারি ঢোকানো শিশু বা কিশোরটির কষ্টকর অভিব্যক্তি দেখে সে সময় কী কষ্টই না হতো আমাদের! কিন্তু সাত বছরের শিশু অসিতের বড়শি বেঁধার পর তাকে নিয়েই ভিক্ষা দৃশ্য আমাদের আরো ব্যথিত করে। এখনই তাকে চড়কে ঝুলানো হচ্ছে- ওই তো চড়কগাছের মাথা থেকে নেমে আসা প্রলম্বিত দড়িতে বেঁধে দেওয়া হলো অসিতের পিঠে বেঁধা বড়শির দড়ি আর চড়কগাছের অন্য প্রান্তের দড়ি ধরে দৌড়ে উঠল একদল মানুষ- শূন্যে উঠে গেল অসিত। সে এক শিহরণ জাগানো দৃশ্য।

শিশু অসিত পিঠে বেঁধা বড়শির টানে শূন্যে চড়কগাছের চারদিকে বনবন করে ঘরতে থাকল। একসময় তাকে নামিয়ে তালপাখায় বাতাস করে চড়কের আয়োজন শেষ করা হলো।

এই হচ্ছে আমাদের বাংলাদেশের একটি অঞ্চলের আদি অকৃত্রিম বছর বরণ ও বছর বিদায়ের চিত্র। যার দিকে আছে পুরাণের সঙ্গে মানুষের বসবাস, কৃত্যাচার, অন্যদিকে আছে স্বাভাবিক আনন্দ অনুষ্ঠান ও গ্রামীণ মানুষের অন্তরঙ্গ জীবনাচারের নাট্যাভিনয়, নৃত্য-গীত এবং সাহসী বাঙালির জীবন নিয়ে খেলা চড়কানুষ্ঠান।

ছবি : **লেখক**